প্রথম অধ্যায়

১৯১০- ৭০ সাল মধ্যবর্তী সময়ে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ॥

যে কোন কালে যে কোন যুদ্ধের অবসানে যা অবশিষ্ট থাকে তা হলো ধ্বংসাবশেষ, আর কিছু ভগ্নমানুষ। নূতন কোন মূল্যবোধ জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের দীর্ঘদিনের ধরে রাখা মূল্যবোধ, নীতিবোধ গুলি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পৃথিবীর অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় বিংশ শতাব্দীর বিশ্বযুদ্ধ দুটি রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্যে প্রবলভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধ দুটির প্রক্রিয়ার মধ্যে পুঁজিবাদী শোষণের চক্র গভীর ভাবে মিশে ছিল। বাঙালী সমাজ থেকে সাহিত্যে এই যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, আর সে কারণেই প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। আলোচ্য তিন শিল্পী - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার, এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই সময় কালেই বর্তমান ছিলেন এবং সাহিত্য রচনা করেছেন। এই জটিল সংকটকালের দ্বারা তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের রচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই সময়।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

পরাধীন ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিশ শতকের গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল, যদিও তা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতার দাবী জানাতে সক্ষম হয়ে ওঠেনি। একদিকে তখন ঔপনিবেশিক সরকারের সক্রিয় বিরোধীদের ওপর নির্যাতন চলছিল, ব্রিটিশ বিরোধী গুপ্ত সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহার্য ১৯০৮-১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত আইনগুলির দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টির একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি করা হয়েছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত নতুন ভারতীয় সংবাদপত্র আইনের আওতায় ঔপনিবেশিক শাসকরা জাতীয় সংবাদপত্র

গুলিকে নির্যাতন করার ব্যাপক ক্ষমতা পায় এবং দেশে পুলিশী সন্ত্রাসের বন্যা দেখা দেয়। এই শতকের গোড়ার দিকে গুপ্তসমিতি গুলি রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কৌশল গ্রহণ করে। বাংলার গুপ্তসমিতির মধ্যে ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' ও কলকাতার 'যুগান্তর পার্টি'-ই প্রধান ছিল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের গৃহীত সংবিধানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে সংবিধানিক উপায়ে ভারতের স্বায়ত্ত শাসন লাভকেই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য ঘোষনা করা হয়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতা গান্ধীর আগমন তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পক্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি ভারতবর্ষে ফিরে ছিলেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে, এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। এই জাতীয় ভিত্তিতে গণ আন্দোলন সংগঠনে গান্ধীর প্রথম প্রধান উদ্যোগ হল 'রাওলাট আইন'-এর বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ। তিনি এই আইনের বিরুদ্ধে ১৯১৯ খ্রীঃ সারা দেশে এক সাধারণ হরতাল আহ্বান করেন। ইতিমধ্যে ১৯১৯ খ্রীঃ ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের জন সাধারণ জালিয়ান-ওয়ালাবাগে একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সভায় যোগ দেয়। এখানে সেনাপতি ডায়ারের আদেশে নিরস্ত্র মানুষের ওপর ইংরেজ সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করে। এই বীভৎস হত্যাকান্ড এবং সরকারের দমননীতি সমগ্র ভারতে বিস্ফোরণ ঘটায়। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসহযোগিতার ক্ষেত্রে দুটি অপরিহার্য অহিংস পর্যায়ের কথা গান্ধী ভেবে ছিলেন। প্রথম পর্যায়ে ইংরেজ সরকারের প্রতি বর্জননীতি গ্রহন অর্থাৎ বর্জিত হবে সম্মানসূচক নিয়োগ ও উপাধি, সরকারী সম্বর্ধনা ইত্যাদি। ব্রিটিশ স্কুল কলেজ আদালত - আইনসভার নির্বাচন, আমদানি পণ্য বর্জন, এবং আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় হবে সরকারী করদান বন্ধ। ১৯২০ খ্রীঃ ১ আগষ্ট আন্দোলন শুরুর দিন ধার্য হয়েছিল। একই দিনে খিলাফত আন্দোলনও সূচিত হয়। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় ভারতীয় মুসলমান সহ সকল সুন্নি মুসলমানের অন্যতম খলিফা, তুরস্কের সুলতানের অধিকার রক্ষার জন্য

মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় নেতাদের উদ্যোগে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনটি ভারতের ব্যাপক সংখ্যক মুসলমানের কাছে আন্দোলনের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে এর ঔপনিবেশিক চরিত্রই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সমান্তরাল বিকাশের ফলে ভারতের দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় - হিন্দু ও মুসলমানের জন্য যুক্তি সংগ্রামে সহযোগিতা ও যৌথ কার্য পরিচালনার অনুকূল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিলো। সমাবেশ, বিক্ষোভ ও নানা ধরনের হরতালের আকারে অসহযোগ আন্দোলনটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছিল।

অসহযোগ আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকের শ্রেণীভিত্তিক কার্যকলাপের পরিসরও ব্যাপকতর হয়ে উঠেছিল। ১৯২০ ও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ধর্মঘট আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। গড় পড়তা ৪ থেকে ৬ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। এর মাধ্যমে শ্রমিকের শ্রেণী ঐক্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তারা ক্রমাগত অধিক পরিমানে সংহতি মূলক ধর্মঘটে শরিক হচ্ছিল। ১৯২১ খ্রী: আসামে চা-বাগিচাগুলিতে ব্যাপক ধর্মঘট দেখা দেয়। ধর্মঘট, আন্দোলন বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম থেকেই দেশে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের একটি নবপর্যায় শুরু হয়েছিল। ১৯৩৬ সালের পর ভারতে শ্রমিক আন্দোলন সুদৃঢ় হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৩৭ সালে বাংলার পাট শিল্পে শ্রমিক ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৫ সালের শেষ দিকে শ্রমিক আন্দোলন জঙ্গী চরিত্র ধারণ করে। এবং ২৯শে জুলাই ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আর একটি গণ সমাবেশ দেখা দেয় তা হল কৃষক আন্দোলন। ১৯২১-২২ খ্রীঃ ব্যাপকতম কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। প্রথমতঃ ফৈজাবাদ ও রায়বেরিলীতে এই আন্দোলন দেখা দেয়। স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থানীয় চরিত্র, বিভিন্ন দলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, নির্দিষ্ট কর্মসূচীর অনুপস্থিতি ইত্যাদি দুর্বলতা সত্ত্বেও যুক্ত প্রদেশের কৃষক আন্দোলন অবশ্যই জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল। বাংলার তেভাগা আন্দোলন ছিল সামন্ততান্ত্রিক শোষনের বিরুদ্ধে বর্গাদারদের সংগ্রাম। ১৯৪৬ খ্রীঃ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক সভাগুলি উত্তরবঙ্গে, যশোহর, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুরে তেভাগা আন্দোলন শুরু করে। উত্তরবঙ্গে এই আন্দোলন এক সর্বাত্মক কৃষক বিদ্রোহের সময় কিষাণ সভার আকারে কৃষক সংগঠনের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয়। তরুণ জহরলাল নেহেরু কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহনের জন্যই প্রথম গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবার পর বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। সবচেয়ে ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটল চট্টগ্রামে সূর্যসেনের নেতৃত্বে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মাধ্যমে। অন্যদিকে ১৯৩০ সালে ৮ই নভেম্বর বিনয়, বাদল, দীনেশ কলকাতার মহাকরণে এক দুঃসাহসিক অভিযানে কারা বিভাগের প্রধান সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করে। এই সময় বাংলার নারীরা রাজনীতিতে অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহন করে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার যে বৈপ্লবিক চেতনা তা পরবর্তীকালে বামপন্থী আন্দোলন ও অগাষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে এবং জাতীয় সংগ্রামকে গতিশীল করে তুলতে সক্ষম হয়। স্বরাজ লাভের সংগ্রামের সম্ভাব্য ধরণ বদল ও গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীন মতানৈক্যের ফলে পার্টির মধ্যে দুটি প্রধান দল সৃষ্টি হয়েছিল। এর প্রথমটিতে ছিল তথাকথিত সাবেকী দল গান্ধীপন্থীরা। জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় উপদলটি ছিল তথা-কথিত 'পরিবর্তনপন্থী'। এতে ছিলেন মতিলাল নেহেরু, বাংলার চিত্তরঞ্জন দাস। দলের মধ্যে নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপের ফলজাত ব্যাপক অসন্তোষ থেকেই কংগ্রেসে বামপন্থী

উপদলের উদ্ভব ঘটে। এই দলের নেতা ছিলেন জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র। বিশের দশকের শেষে ও ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে সুভাষচন্দ্র যুব সংগঠনে, সর্বোপরি ছাত্র সংগঠনেও কংগ্রেসে নিজের প্রভাব মজবুত করেন। ১৯৩৭ সালের পর কংগ্রেস রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে কংগ্রেস সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্র বসুর পুনর্নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীন অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য আকার ধারণ করে। তি জাতীয় সংগ্রামকে গতিশীল ও সংগ্রামমুখী করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং অবিলম্বে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার দাবী রাখেন। তাঁর কর্মসূচী গান্ধী এবং তার গোষ্ঠীর মনঃপুত না হবার জন্য, শুধুমাত্র তাদের অনুগত সভাপতি রূপে তিনি কাজ করতে রাজী হলেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংকটের পটভূমিতে কংগ্রেসকে একটি সংগ্রামমুখী সংগঠনে পরিণত করা প্রয়োজন। তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সহায়তায় ভারতের মুক্তি- সাধন করতে চেয়েছিলেন।

বোম্বাইয়ে ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট ভারতছাড়ো প্রস্তাব গৃহীত হবার পরই ব্রিটিশ সরকারী প্রশাসন দমননীতি অনুসরণে অগ্রসর হল। নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়। এর ফলে ভারতবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং ভারতের সর্বত্র ভারত ছাড়ো বা আগষ্ট আন্দোলনের সূচনা হল। প্রথম পর্যায়ে এই আন্দোলন ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। কলকাতায় ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেয় এবং ট্রামের তার কেটে ও রাস্তা অবরোধ সৃষ্টি করে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে তোলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই আন্দোলনের চরম ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখা যায়। এই পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তমলুক কাঁথি-মহকুমায় গণবিদ্রোহ গড়ে উঠেছিল, কিন্তু বাংলার সব অঞ্চলেই এই আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল, এবং সর্বত্রই সাধারণ কৃষক, নিম্ন-বর্গের মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের ঢাকায় আন্দোলন সর্বাপেক্ষা জঙ্গী

আকার ধারন করেছিল। ঢাকায় আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি হল শিল্প শ্রমিকের আন্দোলনমুখী ভূমিকা। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে বীরভূম, দিনাজপুর জেলার সাঁওতাল ও উপজাতিদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল বিশেষ লক্ষণীয়। উত্তর বাংলায় বালুরঘাট মহকুমায় সাঁওতাল ও রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ পুলিশের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই আগষ্ট আন্দোলন চলাকালীন দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সরকারী দমন নীতির ফলে এই আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে গণ আন্দোলনের ব্যাপ্তি হ্রাস পায় এবং বিচ্ছিন্ন গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হবার পর ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কমিউনিষ্টদের প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক ও কৃষক পার্টির কার্যকলাপ শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের শক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করেছিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত পার্টি সম্মেলনে একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। এবং কমিউনিষ্ট পার্টি দেশব্যাপী সক্রিয় আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। এই সময় ভারতের বিভিন্ন সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দোলনে কমিউনিষ্টরা অগ্রণী ভূমিকা নেয়। কিন্তু বামপন্থী রাজনীতি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মূল পরিচালিকা শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি। কারণ জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের কেন্দ্র বিন্দু ছিল। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম ত্রুটি ছিল দলগুলির আদর্শগত কর্মপন্থা সংক্রান্ত মত বিরোধ। এই মতবিরোধের ফলে বামপন্থী দলগুলি একটি ঐক্যবদ্ধ সাংগঠনিক মঞ্চ গড়ে তুলতে পারেনি। আগষ্ট আন্দোলনের সময়ও বামপন্থী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থাটি গ্রহণ করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারতের বামপন্থী রাজনীতিতে কমিউনিষ্টদের প্রভাব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহ, শহরকেন্দ্রিক শ্রমিক আন্দোলন, তেলেঙ্গানার ঐতিহাসিক সশস্ত্র বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন এবং ত্রিবাঙ্কুরে প্রজা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের অবদান প্রশংসার দাবী রাখে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়েও কমিউনিস্ট পার্টি গণ আন্দোলনের সংগ্রামী ধারা অব্যাহত রাখে। 'দেশব্যাপী ভাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে পার্টির চোখে মুসলিম লীগের প্রকৃত চেহারা ধরা পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ১৯৪৬ সালে মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িকতাবাদী ভূমিকা সম্পর্কে জনসমক্ষে নিন্দা করা হয়। এই বিবৃতিতে বলা হয় - মুসলিম লীগ এ পর্যন্ত কোন প্রকৃত গণ সংগ্রামে অংশগ্রহন করেনি এবং লীগের সংগ্রাম কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে। 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত ইস্তাহারটির পূর্ণবয়ান নিম্নরূপ -

> শৃঙ্খলিত ভারতবাসীর মিলিত সংগ্রাম ভাঙিয়া ফেলিতে দিও না - কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান। কলিকাতার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হইতে দূরে থাকিবার জন্য শ্রমিকদের প্রতি অভিনন্দন।[১]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়। ১৯৪৯ সালে নেহেরু সরকারের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সংঘাত ঘটে, উপলক্ষ্য ছিল সারা ভারত রেল ধর্মঘট। ১৯৫০ সাল জুড়ে সঠিক রাজনীতির সন্ধানে পার্টিতে তীব্র বিতর্ক চলতে থাকে। নৃপেন ব্যানার্জির ভাষায় তখন 'পার্টি র‍্যাঙ্কে-এ হতাশা দেখা দেয় ব্যাপক ও চরম আকারে। তার পাশাপাশি নতুন উপসর্গ দেখা দিল পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সিনিসিজম।' অর্থাৎ আস্থার সংকটে কবলিত গোটা পার্টি। ১৯৫১ সালে স্বাধীনতা উত্তর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্টরা অংশগ্রহন করার অনুমতি লাভ করে।

১৯৪৫ সালের শেষদিকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠল। ১৯৪৬ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তির দাবীতে কলকাতায় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও গণ-আন্দোলন শুরু হয়। দেশব্যাপী বিক্ষোভের ঢেউ - সামরিক বাহিনীর মধ্যেও প্রসারিত হল যা নৌ-বিদ্রোহের আকার নিল। নৌ-বিদ্রোহ শুধু-মাত্র ধর্মঘটী নাবিক ও নৌ-কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বেসামরিক কর্মচারী ছাত্র, শ্রমিক ও অন্যান্য জনগণ এই বিদ্রোহ অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে মুসলীম লীগের নেতা জিন্না দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি উপস্থিত করতে প্রস্তুত হলেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাকিস্তান প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করার প্রস্তাব নেয়। ঐতিহাসিক আর, জি.মুর তাঁর লেখা Escape from Empire গ্রন্থে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সিদ্ধান্তকে 'Jinnah's Rubican বলেছেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন কলকাতায় শোচনীয় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এত ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে তাকে "The Great Calcutta Killing' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কংগ্রেসের আপোষমুখী মনোভাব জিন্নাকে সকল মুসলিম জনগণের একমাত্র মুখপাত্র রূপে তুলে ধরেছিল, আর সেই কারণে কংগ্রেসের পক্ষে পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এবং ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠল। ১৯৪৫-৪৬ সালে ভারত ও বিশ্ব রাজনীতির পট পরিবর্তনের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান প্রায় সুনিশ্চিত ছিল। অবশেষে ভারত স্বাধীনতা লাভ করল ১৯৪৭ সালে। নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা লাভ ভারতের দীর্ঘ মুক্তি-সংগ্রামের চরম পরিণতি। কিন্তু ভারতবাসী মুক্তিলাভের পূর্ণ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হল। দেশ বিভাগের ফলে সমস্ত পরিবেশ যন্ত্রণা ও বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠল, এবং

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেশ বিভাগ সত্ত্বেও ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজ ঘৃনা ও বিদ্বেষের প্রাচীর গড়ে তুলেছে।

স্বাধীনতা উত্তর কালে পঞ্চাশের দশকে রাজ্য বিধান সভাগুলিতে জমিদারি উচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা চলছিল এবং তার দ্রুত বাস্তবায়ন ও জমিদারি উচ্ছেদ সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তনের দাবিকে কেন্দ্র করে কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছিল। ১৯৫৫ খ্রীঃ এই আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে 'গ্রামদান' শুরু হয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণীর প্রবল শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ও বর্ণগত বৈষম্যজাতি সংঘাত, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক, সংগঠনগুলির অধিকতর সক্রিয়তা, স্বতন্ত্র পার্টি গঠন ইত্যাদি ছিল দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচনের পর জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দল তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। ১৯৬২ খ্রীঃ ভারত-চীন সীমান্তে যুদ্ধ বাধলে কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীরা অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে এই সীমান্ত সংঘর্ষ বৃহৎ সামরিক সংঘর্ষে পরিণত হয়। এর পর পরই দেশে সমাজতন্ত্র বিরোধী, কমিউনিষ্ট বিরোধী শক্তিগুলির কার্যকলাপ তুঙ্গে পৌঁছেছিল। এ ছাড়া চীনগণপ্রজাতন্ত্রের সঙ্গে সংঘাতের সময় চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ফলতঃ ভারত পাকিস্তান চুক্তি, বিশেষতঃ কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কঠিনতর হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে ১৯৬৩ খ্রীঃ শেষ নাগাদ চীন ভারত সংঘর্ষের উত্তেজনা, কিছুটা প্রশমিত হওয়ার পর কমিউনিষ্ট পার্টি পুনরায় শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গণ-আন্দোলন শুরু করেছিল। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ এই সময়ে কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী এলাকায়

সংঘর্ষ বাধে, ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, এবং শেষে পাঞ্জাব সীমান্তে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য পর্যায়ে অনেকগুলি কংগ্রেস সংগঠনেই ভাঙন দেখা দিয়েছিল। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর কিছু কিছু রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধীদের যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৯-৭০ সালে কংগ্রেস সরকারই অনুসৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রগতিশীল সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক শক্তি স্থিতিতে বামমুখিনতার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। এর মূলে ছিল প্রধানতঃ সাধারণ গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সপক্ষে মেহনতিদের ব্যাপক গণ আন্দোলন।

ভারতে স্বাধীনতার কিছুকাল পরেই দেশের বিভিন্ন স্থানে জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষ দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং গণ আন্দোলনের চাপে ১৯৫৪ খ্রীঃ রায়ত উচ্ছেদ নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯৫৭ - ৫৮ খ্রীঃ জমিদারি উচ্ছেদ আইনের প্রয়োগের ফলে জমিদার রায়তের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রন হয়েছিল এবং গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পুঁজিতান্ত্রিক সমবায় গঠিত হওয়ায় গ্রাম সমাজের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। এই আন্দোলনকে সফল করার মূলে ছিল প্রধানত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি। শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম ও স্বাধীনতা উত্তর ভারতের গণ-আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন হিসাবে বিবেচ্য। পঞ্চাশের দশকে ধর্মঘটগুলি দেশব্যাপী পরিসর লাভ করেছিল। যেমন কলকাতায় ট্রাম-শ্রমিক ধর্মঘট, স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘট, ১৯৬০ খ্রীঃ বস্ত্রকল, নারকেল শিল্প কারখানায় ধর্মঘট, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির বাবু-কর্মী ও মেহেনতীরা পাঁচদিনের ধর্মঘট পালন করে। এর পরবর্তী সত্তরের দশকে শুরু হয়েছিল নকশাল আন্দোলন। তবে এ আন্দোলনের প্রভাব আলোচ্য তিন গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্রনন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে সে ভাবে দেখা যায় না।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে এক সূত্রে বেঁধে ফেলা হয় এবং ঔপনিবেশিক শোষনের একটি প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয়, এবং দেশের অর্থনীতিতে ক্রমিক অনগ্রসরতার চিত্র সুস্পষ্ট হতে থাকে। দেশের কৃষি অর্থনীতির আর একটি অশুভ নেতিবাচক দিক হল মহাজন শ্রেণীর আবির্ভাব ও শোষণ। ঋণের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়াতে কৃষকগণ জমির ওপর স্বত্ব হারাতে লাগলো, এবং কৃষকেরা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হল। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা, কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস প্রভৃতির ফলে ত্রিশের দশকে ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিতে সঙকট নেমে এলো। ঋণাভাবে জর্জরিত কৃষকগণ জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৪৩ সালের বাংলার মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষে। খাদ্যের অভাবে যে সকল বুভুক্ষু মানুষ কলকাতায় চলে আসে তাদের মধ্যে শতকরা ৪৭ ভাগ ছিল ভূমিহীন কৃষক। বাংলার কৃষক শ্রেণীর শতকরা ৭৫ ভাগ ছিল ক্ষুদ্র চাষী, তারাই অধিকাংশ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ছিল। ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মেদিনীপুরে তেভাগা আন্দোলন, শুরু হয় এবং উত্তর বঙ্গে এই আন্দোলন এক সর্বাত্মক রূপ নেয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাবে শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে বাংলায় সর্বাত্ম কৃষক সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভব হয়নি।

শিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের ভারী শিল্পের অগ্রগতি ছিল অভাবনীয়। তুলনামূলকভাবে সূতীবস্ত্র ও পাট শিল্পে অগ্রগতি তত্টা সন্তোষজনক ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা শোচণীয় হয়ে ওঠে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মজুরি বৃদ্ধি না হওয়ায় তারা ক্রমশ ঋনভারে জর্জরিত হয়ে উঠতে লাগলো। পঞ্চাশের দশকে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য জমিদারদের অধিকাংশ জমিই হস্তান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু ওই জমিতে চাষবাসরত কৃষকদের অবস্থার প্রায় কিছুই পরিবর্তন হয়নি। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই দেশের পুরো অর্থনীতি বড় ধরনের অসুবিধার

সম্মুখিন হয়েছিল। খাদ্যাভাবের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমান কর, মূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির ফলে মেহনতিদের জীবন যাত্রার মান যথেষ্ট নেমে গিয়েছিল। ১৯৭১-এ ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের ফলে উদ্বাস্তুর আশ্রয় ও খাদ্য সংস্থান ভারতের অর্থনীতির ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছিল।

সামাজিক প্রেক্ষাপট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে বাংলার গ্রামগুলি ছিল জমিদারী প্রথার সামন্ততান্ত্রিক গঠনকে ভিত্তি করে। হিন্দু জাতিভিত্তিক কাঠামোতে সম্মান পেতো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। সমাজে ধনী ব্যক্তি সম্মান পেতো অর্থের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বাংলা দেশে কলকাতাকে কেন্দ্র করে গ্রামীন মানুষের নগর মানসিকতা গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়কার প্রায় লেখকের লেখাতেই অনেক ক্ষেত্রেই গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে গ্রাম জীবন থেকে নগরজীবনে চলে আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষ সরকারী চাকুরীকেই অবলম্বন করে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত চাকুরীজীবী বাঙালীরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করে। কারণ চাকুরীই ছিল তাদের অর্থ উপার্জনের একমাত্র উপায়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বিশেষ করে সশস্ত্র বিপ্লবের সময় সমস্ত প্রকার বাধাকে অতিক্রম করে, সামাজিক জড়তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন কর্মসূচীতে ব্যাপক ভাবে নারী সমাজের অংশ গ্রহণ এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা । ১৯২১ সালে এক প্রবন্ধ লিখে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে মহিলাদের অংশ নিতে আহ্বান জানান । অন্য দিকে বিভিন্ন

বিপ্লবী গোষ্ঠীর কাজে বাংলার মহিলাদের বীরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ স্বাধীনতা আন্দোলনে এক গুনগত পরিবর্তন ঘটায় ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'উইমেনস্ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন'[৩] এবং এক দশক পরে গঠিত 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স' নারী সমাজের বিভিন্ন দাবী দাওয়া এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা পালন করতে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখায়, মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবি তোলা হয়। অনেক আন্দোলনের পর ১৯২১ সালে নারীদের ভোটাধিকার দিতে আইন পাশ হয়। দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনকে বাংলার বুকে সার্থক করে তুলতে 'লেডিস পিকেটিং বোর্ড'[৪] নামে সংস্থা বিশেষভাবে সক্রিয় হয়। বিদেশী দ্রব্য বর্জন, দেশী শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচার, কুটির শিল্প ইত্যাদি এই সমিতি চালনা করে। এই সময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মহিলারা নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা গড়ে তোলে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে শিক্ষা বিস্তার কু-সংস্কার বিরোধী প্রচার প্রভৃতিও চলতে থাকে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে বাংলার নারীরা এই দুঃসাহশিক কাজে যে ভাবে অংশ নিয়েছে, তা আজকের নারীদের কাছেও বিস্ময় জাগায়। ১৯৪২-এর ভারতছাড় আন্দোলনেও নারীরা দৃপ্ত বলিষ্ঠতা নিয়ে এগিয়ে আসে। ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে কলকাতায় এবং বোম্বাই-এ এক বিশাল মহিলা শোভাযাত্রা বের হয়। বাংলার তেভাগা আন্দোলনেও নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪২-এ আন্দোলনে বাংলার মেদিনীপুরের মহিলাদের বীরত্ব ছিল অসাধারণ। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে জনজীবনের অর্ধাংশ নারী সমাজ একের পর এক আইনগত অধিকার অর্জন করেছে কিন্তু এই আইনী অধিকার তাদের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করতে পারে নি।

সংবিধানের ১৫ ধারা অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সমান। রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে ৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই স্ত্রী পুরুষ সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত। এছাড়া নারী আন্দোলনের দাবিগুলিকে স্বীকৃতি

দিয়েই হিন্দু বিবাহ আইনের মাধ্যমে এক বিবাহ প্রথা চালু করা হয় ১৯৫৫ সালে। এরই সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের সম অধিকার আইনে মেনে নেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়। একই সঙ্গে মহিলাদের ক্ষেত্রে দত্তক নেবার অধিকার এবং নাবালক সন্তানদের অভিভাবকত্বের দাবি ও স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭৬ সালে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ খোরপোষ ইত্যাদি বিষয়গুলি সংশোধন করা হয়, যা মেয়েদের পক্ষে সুযোগ প্রসারিত করেছে।

নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৮ সালে নারী শিক্ষার জন্য ন্যাশনাল কমিটি দুর্গাবাঈ দেশমুখের নেতৃত্বে গঠন করে। তার সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৯ সালে জাতীয় নারী শিক্ষা পর্ষদ গঠিত হয়। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত চার দশকে নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০ শতাংশের উপর। তবে তুলনামূলকভাবে ২৫-এর উর্ধ্বে নারীরাই নিরক্ষরতার সিংহভাগ জুড়ে আছে। কর্মসংস্থান বা জীবিকার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে উৎপাদনের কাজে যুক্ত হন দারিদ্র সীমার নিচে বাস করা নারীরা। অপেক্ষাকৃত সুচ্ছল পরিবারের নারীদের এখনও উৎপাদনের কাজের সঙ্গে যুক্ত করার রেওয়াজ আমাদের সমাজে হয়নি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাঙালী সমাজে মেয়েরা গুরুত্ব পেতে লাগল। অন্যদিকে বিভিন্ন পরিবারে পরিস্থিতির চাপে মেয়েদের চাকরী গ্রহণ অথবা অন্য কোন ভাবে অর্থ উপার্জন করা, - এই ঘটনা বৃদ্ধি পেতে লাগল। গৃহকর্তাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজে এই ঘটনা চরম আঘাত হানলো, যা বাংলা সমাজ জীবনে একটা বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। পঞ্চাশের দশকে বিষ্ণু দে লিখেছিলেন -

এখন তোমরা শুনি জঙ্গী / কেবল গৃহিনী নয়/
জীবিকার লড়ায়ে তোমরা রঙ্গিলারা / আমাদের
পাশাপাশি, সহকর্মী / কিংবা বলো প্রতিযোগী।

- সংগঠিত ক্ষেত্রে সার্বিক সংখ্যার মাত্র ১৩ ভাগ হচ্ছে নারী কর্মচারী। প্রকৃত পক্ষে মজুরিভিত্তিক কাজে শ্রমে অংশ গ্রহনে সংখ্যা দাঁড়ায় পুরুষ ৬৪ শতাংশ এবং নারী ৭৫ শতাংশ। জমি ভিত্তিক নিরাপত্তার অভাব এবং চাকুরীর দ্বারা অর্জিত অর্থে ক্রম-বর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে মধ্যবিত্ত বাঙালীর সামাল দেওয়া কঠিন হয়েছিল। মূলতঃ এই সংকটের মুখে পড়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙালী মেয়েরা অন্তঃপুর থেকে বাইরের জগতে চাকুরীর সন্ধানে বেড়িয়ে পরে। এছাড়া লক্ষ্যণীয় বিষয় হল নারীদের নিজস্ব মনোনীত ব্যক্তিকে বিবাহ করা নিয়ে পরিবার গুলোতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের খরচ সংগ্রহ করতে বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসক দল ভারতবর্ষের খাদ্য-বস্ত্র অর্থসম্বল যেটুকু ছিল তার ওপরেও রাহাজানি শুরু করে। ফলে একদিকে সাধারণ মানুষের অভাবের সংসারে অনটন শ্বাসরোধকর আকার ধারণ করল, আর এক দল তথাকথিত ধনী শ্রেণী আগ্রাসী শাসক দলের সহযোগিতায় জাতব শোষকবৃত্তি গ্রহণ করে লুণ্ঠন মদমত্ত হয়ে উঠল। অন্নবস্ত্র তথা সব রকমের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ কন্ট্রোলের দুর্নৈতিক নারকীয়তায় ছেয়ে গেল গোটা দেশ এবং সমাজ। পঞ্চাশের মন্বন্তর তথা ১৯৪৩-এর মানুষের তৈরি বাংলা জোড়া ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তারই পরিণতি - লাখ লাখ মানুষ - যেখানে অসহায় জন্তুর মতো মৃত্যু বরণে বাধ্য হয়েছে, অনাহার অপুষ্টিতে। অগণন প্রান সংহারক পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের কারণ কোন ব্যাপক প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়। এর প্রধানতম কারণ, ঘটনার পটভূমি তৈরির একমাত্র ক্রিয়াশীল নিয়ামক, নিয়ন্ত্রক সাম্রাজ্য-বাদী ব্রিটিশ সরকার এবং স্বদেশের সুযোগ সন্ধানী ব্যবসাদার দালাল শ্রেণীর মিলিত উদ্যম। বাংলার সার্বিক জীবন যাপনে সেদিনের ক্ষতচিহ্ন আজও আমরা বয়ে চলেছি প্রতিক্ষণে, আমাদের সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি এবং ব্যক্তিক জীবন যাপনের প্রাত্যহিকতায়।

North Bengal University
Library
Raja Rammohanpur

120846
- 3 JUL 1998

'একান্নর হিসাব' শীর্ষক রচনায় গোপাল হালদার বিশ্লেষণ করেছিলেন তৎকালীন প্রেক্ষিত যা সেই সময়কে জানতে খুবই জরুরি। তিনি বলেছেন -

> ১৩৫০-এ মন্বন্তর গিয়েছিল, ১৩৫১-তে মহামারী এল, ১৩৫০-এ চাল ও খাদ্য-দ্রব্যই বেশি করে চোরা বাজারে গিয়েছিল, ১৩৫১ তে সমস্ত দ্রব্যই চোরাবাজারে গিয়েছে। চোরা বাজারই এখন সদর বাজার হয়েছে ...[৫]

তিনি আরও জানিয়েছেন, সময় প্রেক্ষিতের অনুভব, অভিজ্ঞতার কথা -

> এছাড়াও দেখছি - তাঁতী ও জেলেরা সুতা পায়না, কামারেরা লোহা পায়না, কুমারেরা মাটি পর্যন্ত পায়না - বাঙলার গ্রাম্যজীবন ১৩৫০-এর পর ১৩৫১ তে প্রতিষ্ঠিত হবার মত কোন অবলম্বনই পায়নি।[৬]

'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও নানাবর্তীর অপ্রকাশিত দলিল' শিরোনাম রচনায় লেখক নিরঞ্জন সেনগুপ্ত যে বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন সেই উপাদান সূত্র থেকে সামান্য উদাহরণ তুলে দেওয়া হল। বাংলা সরকারের স্পেশাল অফিসার এল.জি.পিনেল এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় 'সে সময় সমস্যাটা ছিল এই ধরণের হয় কলকাতা এবং কলকাতাকে ঘিরে 'এসেনশিয়াল সার্ভিসেস'-এর জন্য প্রচুর খাদ্য মজুত রাখো, অথবা খাদ্য গ্রামাঞ্চলে যেমন আছে তেমনি থাকতে দাও। কলকাতাতে আমরা প্রচুর খাদ্য মজুত করে ছিলাম। স্বভাবতঃই এর অর্থ হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য লোকের অনাহারে মৃত্যু। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারিতেই গ্রাম বাংলায় গরিবরা অনাহারের মুখোমুখি হচ্ছে, চুরি ডাকাতি বাড়ছে। কাম্যুর 'প্লেগ' উপন্যাসে যেভাবে মহামারী শুরু হয় সেভাবেই বাংলায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। " ... অধ্যাপক হিল দেখেছেন বটানিকাল গার্ডেনস'-এ চালের বস্তার পাহাড় খোলা আকাশের নিচে জলে ভিজে পচছে। শালকিয়ায় মন্ত্রী বরদাপ্রসন্ন পাইন এর পতিত জমিতে লরি বোঝাই করে ১২ হাজার মন পচা আটা ও চাল ফেলে দেওয়া হয়েছে।" [৭]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের আরো এক মর্মন্তুদ চিত্রও পাওয়া যায় টমাস গ্লানমোর ডেভিসের সাক্ষ্য থেকে। ফ্রেন্ডস্ অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট-এর ভারতীয় শাখার পক্ষ থেকে ডেভিস মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার ত্রাণের কাজে গিয়েছিলেন তদন্ত কমিশনের সামনে তিনি বলেন -

> কাঁথি মহকুমার সাধারণ অবস্থার দিনে দিনে ঘটছে। কাঁথি শহরে তার আশে পাশে বিশেষ করে সমুদ্রের উপকূলবর্তী রামনগর থেকে খাজুরি পর্যন্ত অনাহার ও রোগের প্রকোপ বাড়ছে। একদিন যারা 'কৃষক' নামে পরিচিত ছিল তাদের বর্তমান পরিচয় 'ভিক্ষুক'। এই ভিক্ষুকেরা সপরিবারে কাঁথি মহকুমায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা প্রত্যেকেই কঙ্কালসার। কাঁথি যাবার আশে পাশে খালগুলিতে পচা, গলা মৃতদেহ ভেসে চলেছে। পথের ধারে কুঁড়ে ঘর - সেখানেও পচছে মৃতদেহ। সৎকারের কোন ব্যবস্থা নেই।[৮]

সরকারি রিলিফ ব্যবস্থার অসঙ্গতির প্রতিও ডেভিস প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর সাক্ষ্যে -

> খিচুড়ির মধ্যে থাকত অধিক পরিমানে জোয়ার এবং শাক পাতা যা সেই অবস্থায় অনাহার ক্লিষ্ট লোকদের পক্ষে খাওয়াও ছিল বিপদজনক।[৯]

১৯৪৩ সালের ১৭ই মার্চ কমিউনিস্ট মহিলা ফ্রন্টের উদ্যোগে প্রায় ৫০০০ মহিলার এক প্রতিবাদী 'ভুখ-মিছিল' বিধান সভার দিকে হেঁটে গিয়েছিল। ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি পরা হাড়ডিসার মায়ের দল এই মিছিল দিয়ে কশাঘাত করেছিলেন

সভ্যতার বিবেক। - ফসল উৎপাদন আশাব্যঞ্জক হওয়া সত্ত্বেও মূলত যুদ্ধের কারণেই গ্রামের মানুষ তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির কারণে গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সামর্থের বাইরে চলে যায়। এই সংকটময় অবস্থায় গ্রামের মানুষ গ্রামেই বাঁচার চেষ্টা চালায়, পরবর্তীতে তারা দলে দলে ভিড় জমাতে থাকে শহরে, নগরের পথে পথে। ক্ষুধা আর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার আশায়। নিশ্চিত বিশ্বাসে তারা হাত বাড়িয়ে দেয় একটু ফ্যান, প্রাণ ধারনের সামান্য সম্বল প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। যুদ্ধতাড়িত উত্তাল সময়, —এই অবস্থায় নিরন্ন মুমূর্ষুদের বেঁচে থাকার পূর্ণ আশ্বাস নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। এই সময় শুধু খাদ্যই নয় 'বস্ত্রসংকট' এমন চরমে উঠেছিল যে ১৯৪৪ সালে ১০ই মার্চ 'বস্ত্র সংকট দিন' [১০] প্রতি পালিত হয়।

যুদ্ধ, মন্বন্তর সেই সময়ে সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি প্রাণে গভীর নাড়া দিয়েছিল, আর তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল অসাধারণ সব শিল্পকর্ম। মন্বন্তরের আঘাতে বাংলার সাহিত্য, চিত্রকলা, নাটক, অভিনয় গান - এ সবেতেই ছিল 'নতুন জীবন-চেতনা, ঐক্যের বিস্তৃত সম্ভাবনা।'[১১] এই মন্বন্তরের চরিত্র ও চিত্র পাওয়া যায় গোপাল হালদারের 'পঞ্চাশের পথ' 'উনপঞ্চাশ'-এ। মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত' সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি'র সঙ্গে জড়িয়ে আছে যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের আঘাত জর্জর সময় প্রেক্ষনে সৃজনশীল মানসে বিচিত্রমুখী অনুভূতির প্রকাশ পাওয়া যায় তৎকালীন সাময়িক পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায়, আর বাংলা ছোট গল্পের আখ্যান পটে। ১৩৫০ শারদীয় যুগান্তর পঞ্চাশের মন্বন্তরের এক বিশিষ্ট দলিল। কবিতার মধ্যে ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফ্যান', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'স্মাফর' ইত্যাদি। এই সব রচনা আজ আর শুধু শিল্প নন্দনের বিচারে নয়, সমাজ সংকটের অন্যতম দলিল হিসেবেও তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যবান।

ভারতের স্বাধীনতার ঠিক পূর্বে এবং অব্যবহিত পরে দুই বাংলারই মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ভয়াল রূপকে। যে হিন্দু মুসলমান পরস্পর ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে তারাই পরস্পর চরম শত্রুতে পরিণত হল। সমাজ জীবনে এর প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকর হয়েছিল। যার জের আজও আমাদের বহন করতে হচ্ছে। এই সময়কার সাহিত্যে এই সমস্যাটি একটি প্রধান বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রীঃ ১৬ই অগাস্ট কলকাতায় চারদিন ধরে যে নরমেধ যজ্ঞ হয় তাতে ৫ হাজার নর-নারী বৃদ্ধ শিশু নিষ্ঠুর ভাবে নিহত ১৫ হাজারের মত আহত কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট এবং নারীর অমর্যাদার বহু ঘটনা ঘটে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য হিন্দুদের সুধর্মীয়দের এবং মুসলমানদের ও মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ায় বিপুল সংখ্যায় স্থানান্তকরণ করে দেশ বিভাগের ভিত্তি রচনা করা হয়। বলা বাহুল্য চারদিনের প্রাথমিক মারণ যজ্ঞে হিন্দু ও মুসলমান এক সঙ্গে থাকতে পারেনা এবং সে কারণেই দেশ বিভাগ অপরিহার্য - এই মানসিকতারও বীজ বপন হয়। এই অভূতপূর্ব ভাতৃহত্যার দায়িত্ব সম্বন্ধে কলকাতার স্টেট্‌সম্যান, পত্রিকার সেই সময়কার একটি সম্পাদকীয়র উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে -

> এক মহৎ প্রদেশের রাজধানীতে যে আতঙ্কজনক নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ভারতের ইতিহাসে তা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ...।[১২]

সেই প্রথম দাঙ্গায় ব্যাপকভাবে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমার ব্যবহার শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পরিবেশে তা সহজলভ্য ছিল। এই সময় থেকেই সমাজে এক শ্রেণীর সমাজ বিরোধীর সৃষ্টি হয় যারা সমাজে ভীতির কারণ হয়ে উঠতে লাগল। ১৯৪৬ খ্রীঃ নরমেধ-যজ্ঞের পর সমাজ নেতা ভদ্রলোক ও অসামাজিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধের মধ্যে একটা গুনগত পরিবর্তন ঘটে গেল। তারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সংগঠিত করে সমাজের নেতৃত্ব পাবার পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে লাগল।

কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রাম মৈমনসিংহ, বরিশাল ও পাবনা প্রভৃতি জেলাতে ছোট বড় দাঙ্গা হলেও নোয়াখালি, ত্রিপুরা সন্দীপ এলাকায় যে এক তরফা হিন্দু নিধন ও উৎপীড়ন পর্বের সূত্রপাত হয় তা এর মধ্যে ভীষণতম। এই দাঙ্গায় গৃহত্যাগী হয়ে হাজার হাজার নর নারী পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আশ্রয় নেয়। কলকাতায় এই পর্যায়ে দাঙ্গা শান্ত হয় স্বাধীনতার পর গান্ধীজীর প্রয়াসে। ১০ই অক্টোবর থেকে পনের দিন একটানা যে দাঙ্গা হয় তাতে ব্যাপক বাস্তু ত্যাগ ঘটে। ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন এবং অগ্নি সংযোগের ঘটনাবলীতে প্রায় ৫০ হাজার নর-নারী প্রভাবিত হয়েছিল বলে একটি হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু এ সব থেকেও শোচনীয় ঘটনা হল বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস বা অপবিত্র করা, বহু ব্যক্তিকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা এবং সর্বোপরি বহু নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করা ও জোর করে দাঙ্গায় সদ্য বিধবা ও তরুণী, বৃদ্ধাকে এক শ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া। '... বাঙালীর এই দুঃসময় এবং বিশেষ করে নারী জাতির অসম্মানে বিচলিত মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ক্ষান্তি দিয়ে শ্মশানে শিবের মত নোয়াখালির ও তৎসংলগ্ন পীড়িত অঞ্চলে শান্তি মিশনের সূচনা করেন। '

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় যার সূত্রপাত সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষে গোটা দেশ জর্জর। আর ১৯৪৭ সালের মার্চ থেকে পাঞ্জাবের বুকে শুরু হয় পৈচাশিক হত্যালীলা। এই পটভূমিতে নেমে এলো বাংলার নববর্ষ। ১৯৫০ সালে ১০ই ফেব্রুয়ারিতে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। ১১ই ফেব্রুয়ারির যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশ -

> এবার আর দেশবন্ধুপার্ক অঞ্চলের নিকাশী পাড়া বস্তি রক্ষা পেল না। প্রচন্ড বোমাবাজি করে সেখানকার মুসলমান বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করা হল।

ধীরেন মজুমদার বলছেন -

> গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য বেলগাছিয়ার মুসলমান বস্তি রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যান।[১৩]

মার্চ মাসের গোড়াতে বরিশালে শুরু হল ব্যাপক দাঙ্গা। দাঙ্গায় নিহতদের তালিকা প্রকাশ হতে থাকে যুগান্তর সংবাদপত্রের পাতায়। তারই বদলা চলতে থাকে পশ্চিম-বাংলায়। এই রায়টের ফলে সমাজের বুকে আর একটি সমস্যা দেখা দিল তা হল উদ্বাস্তু সমস্যা।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে উভয়বঙ্গেই বাস্তুহারা হয়েছে হাজার হাজার মানুষ, তারা প্রাণটুকুকে সম্বল করে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৫০-এ বরিশালে রায়টের পর উদ্বাস্তু স্রোত প্লাবনের আকারে ধেয়ে আসে কলকাতার দিকে। এই সময় বিপন্ন মানুষের ত্রানকার্যে এগিয়ে আসে দেশের কমিউনিস্টরা। বাংলার বিপন্ন বাস্তুহারাকে বাঁচাবার জন্য অম্বিকা চক্রবর্তীর ব্যাকুল আহ্বান প্রকাশিত হয় ১লা মে যুগান্তরের পাতায়।

> ... বাংলার বুকের উপর আবার বীভৎস হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় দলে দলে হিন্দু মুসলমান সর্বহারা হইয়া পূর্ববাংলা হইতে পশ্চিম বাংলায়, পশ্চিম বাংলা হইতে পূর্ব বাংলায় চলিয়া যাইতেছে। আজ যখন বাংলার দুই অংশে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান গ্রাম হইতে উৎখাত ও ধ্বংস হইয়া যাইতেছে তখন দেখিতেছি যে এই সব দাঙ্গা দুর্গত বাস্তুহারাদের সমস্যা ধামা চাপা দিয়া নানা অবাস্তব রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেহবা যুদ্ধের, কেহবা লুটতরাজ কেহবা জোরপূর্বক মুসলমান বাড়ী হিন্দুর দখলের, হিন্দুর বাড়ি মুসলমানের দখলের উস্কানি দিতেছে।[১৪]

৪ঠা জুলাই 'যুগান্তর'-এর এক খবরে প্রকাশ : গত সপ্তাহে শিয়ালদহ স্টেশনে পূর্ববাংলা থেকে পঁচিশ হাজার ছিন্নমূল নর-নারী এসে পৌঁছেছে। তার মধ্যে সতেরো হাজার স্টেশন চত্বরেই অবস্থানরত।' [১৫] খাদ্য পানীয় ও স্থানাভাবে তাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। জুনের শেষ ভাগ থেকে বাস্তুহারাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং প্রতিদিন গড়ে সাড়ে তিন হাজার শরনার্থী শিয়ালদহে এসে পৌঁছচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকে দেশের বাড়ি ঘর বিক্রি করে দিয়েছে বা ফেলে এসেছে। আর দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই তাদের। এছাড়াও যুগান্তরে ১২শে জুলাই-এর খবরে প্রকাশ 'শিয়ালদহ স্টেশনে চারজন শর-নার্থীর মৃত্যু ঘটেছে এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে নানা রকম সংক্রামক রোগের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে।' [১৬]

উদ্বাস্তুদের মধ্যে দুটি শ্রেণী ছিল, কৃষিজীবী ও অকৃষিজীবী। কৃষিজীবীরা মোটামুটি কিছু কিছু জমিতে চাষাবাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করছিল। অকৃষিজীবীরা বেছে নিয়েছিল ঘনবসতি পূর্ণ শিল্পাঞ্চল গুলিকে, যেখানে তারা জীবিকার সন্ধান করতে পারে। ১৯৫০-এর পূর্বে যে সব পরিবার পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তাদের মনোভাব ছিল যে তারা যেকোন উপায়ে জীবিকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে। তারা দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে উৎখাত হয়ে প্রাণ ভয়ে পাকিস্তান ত্যাগ করেনি। স্বাধীনতা লাভের পর নিকৃষ্ট নাগরিক রূপে তারা পাকিস্তানে বাস করতে চায়নি বলেই ভারতে চলে এসেছিল। কিন্তু ১৯৫০-এ যে পরিবার-গুলি দাঙ্গার ফলে এদেশে চলে এসেছিল তাদের মনোভাব ছিল অন্যরকম। প্রতিকূল ঘটনার চাপে পড়েই তারা চলে এসেছিল, পূর্ব পুরুষের ভিটা একেবারে ত্যাগ করবে বলে আসেনি। তাদের পূর্ববঙ্গে পুনরায় ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। উদ্বাস্তু যুবকদের জন্য কলকাতা সংলগ্ন স্থানে শিল্পাঞ্চলে চাকুরির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার শিল্পাঞ্চল দূরে অবস্থিত নূতন অকৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের চাকরি দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেই কারণে এই সব অঞ্চলে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

১৯৫০-এর দাঙ্গার সময় পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যখন দেশত্যাগ করে এদেশে আসতে লাগল তখন পূর্ববঙ্গের হিন্দুর জন্য এদেশের মানুষের মন কাঁদত। তারা যখন দলে দলে বাস্তুত্যাগ করে এখানে আসতে লাগল তাদের সেবাকার্যে কত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তারপর বছরের পর বছর যেমন এগোতে লাগল এই উদ্বাস্তু-দের প্রতি পশ্চিম বাংলার মানুষের মনোভাব ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠল। সহানুভূতির পরিবর্তে ক্রমশ বিদ্বেষভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠল। এর কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার ফলে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেতে লাগল। পশ্চিমবাংলার শহরাঞ্চলগুলি ক্রমশই ঘন-বসতিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগলো এবং স্থানাভাব দেখা দিল। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হতে লাগল এবং জনজীবনের বেকার সমস্যা দেখা দিল। বেকার সমস্যার ফলে সমাজে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাংলা গল্প উপন্যাসের অনেক ক্ষেত্রে এই উদ্বাস্তু সমস্যা এবং বেকার সমস্যা অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। ষাটের দশকে এবং সত্তরের দশকে বাংলার সমাজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ অনুভূত হল। মানুষ চিন্তা ও বাক্ স্বাধীনতার প্রয়োজন উপলব্ধি করলো। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী পদ্ধতির অধীন হয়ে পড়তে লাগলো। দেশের অসংখ্য মানুষ রয়ে গেল দারিদ্র সীমার নীচে। অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষেরা সংগ্রামী হয়ে উঠতে শুরু করলো। দলবদ্ধ হতে লাগলো। শোষিত মানুষেরা ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগলো। বাংলা সাহিত্যে, ছোটগল্পকারদের গল্পে এই সংগ্রামী চেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আমাদের সমাজ জীবনে যে সমস্যাগুলি দেখা দিল তা আমাদের আলোচ্য তিন শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

তথ্যপঞ্জী

১. অমলেন্দু সেনগুপ্ত - উত্তাল চল্লিশ - অসমাপ্ত বিপ্লব, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ২১৮ প্রকাশক পাল পাবলিশার্স।

২. তদেব, পৃষ্ঠা ৪১৬

৩. শ্যামলী গুপ্ত ও কান্তি বিশ্বাস - নারী ও সমতা, ৩০শে মার্চ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৬৩

৪. তদেব পৃষ্ঠা ৬৭

৫. সমীর ঘোষ - পঞ্চাশের মন্বন্তর শিল্পে সাহিত্যে, ১৯৯৪, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ১২

৬. তদেব, পৃষ্ঠা ১২

৭. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ১৫

৯. তদেব, পৃষ্ঠা ১৬

১০. তদেব, পৃষ্ঠা ২৫

১১. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০

১২. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - দাঙ্গার ইতিহাস, ১৪০১, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স পৃষ্ঠা ৬০

১৩. অমলেন্দু সেনগুপ্ত - উত্তাল চল্লিশ - অসমাপ্ত বিপ্লব, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ৪০১

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০৮-৪০৯

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০৯

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা ৪০৯

তিন শিল্পীর অব্যবহিত পূর্ববর্তী গল্পকারেরা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার মজুমদার এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অব্যবহিত পূর্ববর্তী লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে যে তারা সমাজের কোন্ কোন্ বিষয়কে গল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং সমাজের কোন পরিস্থিতিগুলি তাদের ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছিল, তাদের গল্পের বিষয় ও ধরনের সঙ্গে আলোচ্য তিনজনের পার্থক্য কোথায় ? আলোচ্য তিন গল্পকারের পূর্ববর্তী লেখকেরা হলেন মোটামুটি ভাবে জগদীশগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, এছাড়া রয়েছেন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুবোধ ঘোষ।

কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের তুলনায় বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। অচিন্ত্যকুমার তার প্রসঙ্গে বলেছিলেন "বয়সে কিছু বড়, কিন্তু বোধে সমান তেজোজ্জ্বল। তারও যেটা দোষ সেটা ঐ তারুণ্যের দোষ - হয়তো বা প্রগাঢ় প্রৌঢ়তার।" তাঁর যথার্থ আবির্ভাবের সময় এবং মুখ্য প্রকাশের কাল হল 'কল্লোল', 'কালি-কলম'এর সময়ে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে তাঁর প্রথম মৌলিক গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'বিজলী'র পৃষ্ঠায় ১৩৩১ বাংলা সালে। প্রথম অবস্থায় তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল কবিতার মধ্য দিয়ে। অনেকের মতে পরিণত বয়সে যখন গল্প লিখলেন তখন দেখা গেল - 'তিনি philosophy of sex বা কামতত্ত্বের বিশেষ ধার ধারেন না।" [১] আবার ভূদেব চৌধুরীর মতে - "যৌনতার প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্তের কোন কুণ্ঠা নেই, অথচ সে বিষয়ে কোন বিশেষ ঔৎসুক্যও অন্ততঃ তার ছোটগল্পের জগতে অতিশয় ছায়া সম্পাত করতে পারেনি। ... জগদীশগুপ্ত অবিশ্বাসী তাহলেও বিশ্বাসহীন নন তিনি।" তাঁর গল্পে যৌনতা যেখানে আছে সেখানেও উদ্দীপক নয়, বরং একটা ঘৃণামিশ্রিত ভাব রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে।

বিধাতার প্রতি এক ধরণের ঘৃণাকে দৃঢ়তার সঙ্গে তার গল্পে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা বাংলা সাহিত্যে আর কোন লেখকের মধ্যে দেখা যায় না। সে কারণেই তার প্রথম গল্প সংকলন 'বিনোদিনী' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন 'ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।' তাঁর গল্পের শৈলীতে একটি দৃঢ় সংবদ্ধ রূপ লক্ষ্য করা যায় যা তার নিজের অস্তিত্বের মতোই। তির্যক স্পষ্টোক্তি গল্পগুলিকে দৃঢ় হতে আরো সহায়তা করেছে। ... নিছক বাস্তব জীবনের কার্যকারণের সম্পর্কে জগদীশ গুপ্তের অধিকাংশ গল্পের বিষয় বস্তুকেই অস্বাভাবিক, এমনকি অসম্ভব বলেও মনে হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে নিছক সুপ্রদৃষ্ট দুর্ঘটনা সফল করবার জন্যই কামদা নদীতে কুমীরের অকারণ আবির্ভাব (দিবসের শেষে') অথবা শিবপ্রিয়ের অন্তর্ধান, নিত্যর আত্মহত্যা, শিব-প্রিয়ের গ্রামত্যাগ ও ভিক্ষাবৃত্তিগ্রহণ ইত্যাদির মধ্যে কার্যকারণের কোন অনিবার্য সংগতি নেই। কিংবা তার চেয়েও ভয়াবহ অবিশ্বাস্যতা রয়েছে, নিতান্ত অনায়াসে যা চিত্রিত হয়েছে জগদীশ গুপ্তের গল্পে।

তাঁর গল্পে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা রয়েছে - যেমন 'চার পয়সার এক আনা' গল্পে দেখা যায় কুড়িয়ে পাওয়া একটি 'আনি' চরম দরিদ্র পরিবারে প্রায় পাশবিক কোলাহল ও ঈর্ষা সৃষ্টি করেছে। নিষ্ঠুরতার চরম প্রকাশ দেখা যায় 'পয়োমুখম্' গল্পে। আবার কখনো তিনি মানুষকে নিছক দেহবাদের উর্ধ্বে তুলেছেন এবং সুস্থ মানবিক সম্পর্কের প্রতি তার গভীর আকর্ষনের ইঙ্গিত দিয়েছেন যেমন 'চন্দ্রসূর্য যতোদিন' গল্পে সুর্ণপ্রভার মন তার দেহ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল বলেই সে উন্মাদ হয়েছিল। বারাঙ্গনা চরিত্রগুলির চিত্রন প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রী চারুবালা দেবী বলেন যে ৩।৪ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি পতিতাদের বাড়ীতে খেলাধূলা করতেন এবং নিম্নশ্রেণীর পুরুষ বা মেয়ে মানুষ ঝগড়া করছে দেখলে তিনি দাঁড়িয়ে যতক্ষন সম্ভব ঐ ঝগড়া শুনতেন। এছাড়া তাঁর জীবনকালেই দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে। তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে ধ্বংসমুখী গ্রাম, বিপত্নীক কৃষক এবং এমন সব মানুষ,

প্রচলিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধে যাদের সংশয়। জগদীশ গুপ্তের শব্দচয়ন বাক্যরীতি সাবেকী, কিন্তু তা দিয়েই তিনি ব্যক্তি চেতনায় যে অনিশ্চিয়তা দুঃখবোধ ও অর্থহীনতার অভিঘাত এসেছে তাকে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি মানুষের দুঃখ পাপ বন্ধনের দিকটি গল্পে তুলে ধরতে চেয়েছেন। হাসান আজিজুল হকের মতে 'জগদীশ গুপ্ত তার সৃষ্ট জগতে যেভাবে লোভ, হিংসা, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা অন্ধ প্রতিযোগিতা, বীভৎস যৌনতা ইত্যাদি স্তূপাকার করে তুলেছেন তাতে মানুষ তার আড়ালে পড়ে গেছে।'[৩] কিন্তু জগদীশগুপ্ত ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন নির্লোভ, নির্লিপ্ত অনাসক্ত। তাই তাঁর চোখ অনাসক্ত প্রসন্নতার সঙ্গে মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ ভাল মন্দ, পাপপুণ্য প্রেম-জিঘাংসা সব কিছুকেই ক্রিয়াশীল হতে দেখেছে এবং সেগুলিকেই তিনি সাহিত্যে নতুন ভাবে সাজিয়েছেন। জগদীশ গুপ্ত তার গল্পে অনেক সময়েই মানুষের অন্যায় ও অবনমনের মূলে যে অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান তা স্বীকার করেছেন। 'কিন্তু তার আরো একটি গভীরতর সিদ্ধান্ত ছিল, তা হল বহু মানুষই স্বভাবতই অসৎ হয় অন্যায় তাদের স্বাভাবিক আসক্তি। তা প্রত্যক্ষ কোন আর্থিক অভাবের ওপর নির্ভর করে না।'[৪]

কল্লোলের লেখক গোষ্ঠীর মতো জগদীশ গুপ্ত কোনদিনই রোমান্টিক স্বপ্নের পথে পা বাড়াননি তিনি আদৌ আবেগ প্রবণ ছিলেন কিনা সন্দেহের অবকাশ থাকে। 'তার নির্মোহ নিরাসক্ত কঠিন দৃষ্টির দর্পনে তাই উদ্ভাসিত হতে পেরেছে জীবনের এক নিষ্ঠুর সত্যের ভয়ংকর মুখচ্ছবি।'[৫] তিনি বাংলা সাহিত্যের জগতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলা যেতে পারে, এই স্বাতন্ত্রের পেছনে রয়েছে তাঁর বিষয়বস্তু নির্মানে, চরিত্র চিত্রনে কাহিনীর পট পরিকল্পনায় সমাজ জীবনকে ভিন্ন কোন থেকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। মহাযুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত মূল্যবোধের ওপর দাঁড়িয়ে অনেক সময়ই তিনি কোন আশার বাণী আমাদের শোনাতে পারেননি। সমাজ ব্যবস্থার নিয়তির নিষ্পেষণে বা অমোঘ নিয়মে

বিপর্যস্ত মানুষ নিয়েই তার পয়োমুখম্' 'দিবসের শেষে', 'অসাধু সিদ্ধার্থ'-এর মতো গল্পগুলি দাঁড়িয়ে আছে। যেহেতু চরিত্ররাই তাঁর উদ্দিষ্ট তাই তাদের নিয়েই গড়ে উঠেছে তার সাহিত্য। তার গল্পগুলি নিয়মতান্ত্রিক কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন। তার লেখা লেখক জীবনের সূচনা হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগেই, মানুষ তখন থেকেই তার পুরাতন মূল্যবোধকে হারিয়েছে, যার ফলে মনে হচ্ছে মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টাই তাৎপর্যহীন। মানুষের দুঃখ, কথাকে তিনি একটা বিশেষ পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, তাই কাহিনীর বিকাশ, পরিণতি তার কাছে বড় হয়ে ওঠে নি, বরং তার সাহিত্যে দুঃখ কষ্ট নির্যাতিত মানুষের বাঁচার বৃথা চেষ্টাটাই বড় হয়ে উঠেছে। তার গল্পে তিনি অধিক পরিমাণে দেখাতে চেয়েছেন 'মানুষের স্বভাবের দৈন্য কদর্যতা নোংরামি, দেখিয়েছেন জীবনের অন্তর্নিহিত শুশ্রিভবনের শক্তি- বারে বারে মানুষের অমানুষিক নীচতা ও ইতরতার কাছে কীভাবে পরাভব মানে।'[৬] বাস্তবতার সমস্যাকে তিনি তত গুরুত্ব দেননি বরং বলা চলে 'তাঁর কাছে অনেক বেশি জরুরি ছিল মানুষের সহজাত ইতরতার রূপায়ণ'[৭]। মানুষের কোন শুভবোধকে তিনি সত্যের আলোয় প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি কারণ 'মানুষের সংসারে তিনি দেখেছিলেন নৃশংস অ-মানবিকতা, মনুষ্যত্বহীনতা।'[৮]

জগদীশ গুপ্তের সমসাময়িক কালে একটা রোমান্টিক বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। এই বিদ্রোহ প্রধানত এসেছিল 'কালি-কলম', 'কল্লোলের লেখকদের কাছ থেকে। এদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ প্রভৃতিরা। এই লেখকেরা ব্যক্তির জীবনের বঞ্চনা অতৃপ্তিকে বাস্তব পটভূমিকায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। তাদের রচনায় বঞ্চনার ক্ষোভ, উৎপীড়নের ছবি ফুটে উঠেছে, এবং সমাজ কাঠামোর প্রতি একটা তিক্ততা কখনও কখনও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যে দৃষ্টিতে তারা সব কিছুর

সমাধানের কথা ভেবেছিলেন তা ছিল রোমান্টিকতার বিরুদ্ধ বিস্ময়। অচিন্ত্যকুমার কল্লোল সম্পর্কে বলেছেন - কল্লোলের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল দুটো - (১) প্রবল বিরুদ্ধবাদ, (২) বিহ্বলভাববিলাস। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানেই থেমে থাকেন নি, তাঁর প্রথম গল্প 'শুধু কেরানী' এতে দেখা যায় অনেক মৃত্যু সত্ত্বেও বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয় এখানে দেখা যায়, কিন্তু এর থেকে তিনি অতিক্রম হতে চেয়েছেন।

প্রেমেন্দ্রের ছোট গল্পগুলিতে একটা চাপা টেনশন সবসময় অনুভব করা যায়। এই 'টেনশনকে ঠিক তারে বাঁধতে গিয়েই তিনি রচনা করে নিয়েছিলেন একটা একান্ত নিজস্ব শিল্পশৃঙ্খলা।'[৫] বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা গল্প উপন্যাসে দরিদ্র জীবন ও চরিত্র যে রকম গুরুত্ব পেয়েছে তা পূর্বে ছিল না। সামাজিক জীবনে একদিকে যেমন শ্রমিক কৃষক নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনে নেমে আসছে তীব্র অর্থনৈতিক বিপর্যয় তেমনি ধর্মঘট, খাজনা বন্ধের চিন্তা, মনুষ্যত্বের মর্যাদা দাবী প্রভৃতি দরিদ্র মানুষের বড়ো মাপে সাহিত্যে আসার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিল। মধ্যবিত্ত জীবনের দুর্গতি চিত্রিত হয়েছিল ব্যাপকভাবে কারণ লেখকেরা প্রায় সবাই ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলিতে রয়েছে এই বিপর্যয়ের কথা যেমন। 'উপনয়ন' গল্পে দেখা যায় ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের সর্বগ্রাসী ভাঙন, আর্থিক বিপর্যয়ের কথা। জীবিকাগত শূন্যতার কথাই শুধু নয় তাঁর গল্পে যে নারী পুরুষকে আমরা পাই তারা সবদিক দিয়ে নিরবলম্ব। আদর্শের দিক দিয়ে ভাবনার দিক দিয়ে, মূল্যের দিক দিয়ে নিজেদের চিনিয়ে দেবার মতো কোন বাসনা তাদের নেই। ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার গল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন '... কিন্তু এই কল্পনার মধ্যে এক প্রকার অপ্রকৃতিস্থতা (morbidity) বা মনোবিকারের ইঙ্গিত আছে।' কিন্তু ভূদেব চৌধুরীর

মতকে অনুসরণ করে বলা যায় যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের morbidity প্রকৃতপক্ষে এক ভারসাম্যহীন, অসুস্থ যুগজীবন যন্ত্রনাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে তার শৈল্পিক প্রকাশমাত্র। দেহজীবিনীদের নিয়ে লেখা তার 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পে দেখা যায় অন্ধকার নগর পথে বেগুনতার গত্যন্তর বিহীন সঙ্গীটিকে নিয়ে চলতে থাকে। সে যাত্রায় আনন্দ নেই, আশা নেই, আশ্বাস নেই, কিন্তু পরাজয়ও নেই। 'লেখক এখানে এবং সর্বত্রই জীবনের গ্রীম গম্ভীর বিষন্নমূর্তি গড়ে তোলেন। তা যে কখনো মর্বিড হয়ে ওঠে নি তার এটাই কারণ - অস্তিত্বকে সময়ের হাতে, নিয়তির হাতে লাঞ্ছিত হতে দেখেও সে লাঞ্ছনাই ভবিতব্য - একথা জেনেও সে ভূমিশায়ী হয়না।'[১] তাঁর লেখায় কখনো ব্যক্তির যৌন চেতনা প্রশ্রয় পেলনা। তার কারণ তিনি মানুষের সমগ্র অর্থ খুঁজতে চেয়েছিলেন। মানুষের সমগ্র অর্থে কাছে তার জীবিকা, শ্রেণী সংস্থান যৌনতা এগুলি শেষ পর্যন্ত গৌণ,- এই ছিল তার জীবনার্থ বোধ।

মধ্যবিত্ত জীবনের নিরন্তর টিকে থাকার লড়াই দেখতে পাওয়া যায় তার 'শুধু কেরানী', 'পুন্নাম', 'কুয়াশা', 'শৃঙ্খল' ইত্যাদি গল্পে। পতিতাদের জীবন কাহিনীতে সজল হয়ে উঠেছে তার 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'মহানগর', 'সংসার সীমান্তে' ইত্যাদি গল্পগুলি। আবার মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতিকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন 'শৃঙ্খল', 'হয়তো', 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্পগুলিতে। যুদ্ধোত্তরকালীন ভারতবর্ষে যে মানুষের চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সব মানুষই যেন ভঙ্গুর মানুষ অসারত্বের সামনে মানুষ দাড়িয়ে আছে। 'পুন্নাম' গল্পে দেখা যায় লোলিত চুরি করে কিন্তু সেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। এখানে মূল্যবোধের একটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। লোলিত আত্মসমীক্ষা বা যুগসমীক্ষা করে যা পাচ্ছে সেটা ননর্থক। আবার 'সংসার সীমান্তে' গল্পে রজনী অপেক্ষা করে উজ্জ্বলতর জীবনের জন্য, জীবনের প্রতি আগ্রহে এ গল্পের শেষ হয়। মহানগর গল্পেও রয়েছে পতিতা জীবন থেকে উদ্ধার করার এক প্রতিজ্ঞার কথা। এ গল্পে ছোট

রতন দিদিকে এই শহরের পতিতাজীবন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা করে। এগল্পেও রয়েছে অন্ধকার জীবন থেকে আলোর জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। প্রথম পর্যায়ে তার গল্পে একটা ব্যঙ্গ রয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালের গল্পে রয়েছে অসীম দরদ। যে মানুষ প্রবৃত্তি দিয়ে গড়া, কামনা দিয়ে গাঁথা সেই মানুষের পরিচয়ের অন্বেষণে নিবিষ্ট ছিলেন তিনি।

কল্লোলের অন্যতম লেখক হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রথম মহা যুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকে সমস্ত জগতে যে একটা ভাঙনের ইতিহাস রচিত হচ্ছিল, যাতে ছিল সংশয়, সন্দেহ পুরাতন মূল্যকে দূরে নিক্ষেপ করা ব্যক্তি জীবনের নিশ্চিত আরামের অবলুপ্তি - বাংলা সাহিত্যের কথাসাহিত্যিকরা সেই সমস্ত জীবনবোধকে বিভিন্ন-ভাবে তাদের সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। জনৈক সমালোচক বলেছিলেন যে কল্লোলের কথা সাহিত্যিকেরাই প্রথম অনুভব করে যে অর্থনীতিই মানুষকে যথেষ্ট পরিমানে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তি অভিজ্ঞতাই যে অচিন্ত্যকুমারের সত্তার ভিত্তিতে ছিল তা বোঝা যায় তাঁর এই মন্তব্য থেকে - এমনি অর্থাভাব প্রত্যেকের পায়ে পায়ে ফিরেছে। মাপেরা নিশ্বাস ফেলছে স্বচ্ছতায়। হাঁড়ি চাপিয়ে চালের সন্ধানে বেরিয়েছে। ... শৈলজা খোলার বস্তিতে থেকেছে পানের দোকান দিয়েছিল ভবানীপুরে। প্রেমেন ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখেছে, খবরের কাগজের প্রুফ দেখেছে। নৃপেন টিউশানী করেছে বাজারের ভাড়াটে নোট লিখেছে।' - এর চূড়ান্ত উদাহরণ হয়তো দেওয়া যেতে পারে তার 'হাড়' গল্প থেকে, যেখানে স্বামীর কতকাল বেচে সেই অর্থে জীবন যাপনের কথা ভাবে এক স্ত্রীলোক।

'কল্লোল' পর্বের অনেক লেখকের মত অচিন্ত্যকুমারের লেখনীতেও মানুষের দুঃখ দারিদ্র সুপ্রভঙ্গের দেশের লোকায়ত জনজীবনের দুঃখ-দারিদ্রের বাস্তব ছবি নয়।

কৃষক, মজুর তাঁর সাহিত্যে এসেছে যখন তিনি পরিণত জীবনে মফঃস্বল শহর ও গ্রাম বাংলাকে তার কর্মসূত্রে খুব কাছের থেকে জানার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি বিচারক হিসেবে বাংলার বিভিন্ন জেলায় থেকেছেন। বিচারালয়ে নানা ধরনের মানুষের উপস্থিতিতে তাদের সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ তার হয়েছিল, এবং সেই সূত্রেই বিশেষতঃ - মুসলিম জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যা তার গল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই স্থান করে নিয়েছে। বিচারক থাকাকালীন অর্জিত এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারাই তিনি তার চার পাশের ছড়ানো জীবনকে মনস্তাত্ত্বিক খুঁটিনাটিতে ধরে দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতার নানা দিক তাঁর গল্পে বিশ্বাস যোগ্যতা নিয়ে উঠে এসেছে। আবার জোতদার মহাজনের অত্যাচার কণ্টকিত কৃষক শ্রমিকরা তার গল্পের চরিত্র হয়েছে।

—

বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডব মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। যুদ্ধ তার সর্বগ্রাসী জিহ্বা বিস্তার করেছিল - মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ওপরে। শুরু হল কণ্ট্রোল, রেশনিং। এর ফলে শুরু হল কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষের চক্রান্তে কালোবাজারি। চোরাকারবারীর এই অমানুষিক পাপের চিত্র রয়েছে - অচিন্ত্যকুমারের 'কেরোসিন' গল্পটিতে। দাঙ্গা, মন্বন্তর ইত্যাদি পটভূমিকা তিনি তার গল্পে অসাধারণ সার্থকতায় ব্যবহার করেছেন। মন্বন্তর রূপী কালনাগের বিষবাষ্পে বিষাক্ত হয়েছে স্বামী, পিতা পুত্রের সম্পর্ক। ক্ষুধা তাড়িত মানুষের কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায় তার 'বাঁশবাজি' গল্পে। প্রাণের চেয়ে প্রিয় সন্তানকে জীবিকার উপায় করে নিতে মানুষের দ্বিধা হয় না, কেবল মাত্র পেটের ক্ষুধার জন্য। 'চিতা' গল্পেও রয়েছে - মন্বন্তর ক্লিষ্ট মানুষের কাহিনী। যেখানে মৃতদেহের জন্য সংগৃহীত অর্থ দিয়ে মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। ক্ষুধানিবৃত্তির কাছে মৃতদেহের সৎকার অর্থহীন হয়ে যায়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কাক' গল্পে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে মানুষের নিষ্ঠুরতাকে, মানুষের মূল্যহীনতাকে তুলে ধরেছেন। মন্বন্তরের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র সংকট ও সেদিন পঞ্চাশের

বাংলায় কী ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল আজ আর তা শুধু কাগজের রিপোর্টে নয়, গল্পের বিষয়েও পাওয়া যায়। 'বস্ত্র' গল্পটি তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। 'জীবন ধারণের অন্যতম উপাদান বস্ত্রও যে মরণের অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে এবং তাও শুধু লজ্জা নিবারণের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই'[১০] - বস্ত্র গল্প তারই তীব্র করুণ আলেখ্য। জগদীশ গুপ্ত থেকে শুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্র পর্যন্ত বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণে যে মানুষকে পাই তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে জগদীশ গুপ্তে রয়েছে প্রাতিস্বিক মানুষ, অচিন্ত্যকুমারের গল্পে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মানুষ, এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে এ দুয়ের মিশ্রণ ঘটেছে।

এদের প্রায় কাছাকাছি সময়ে এসেছেন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, এবং কিছু পরবর্তী সময়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে মিশে রয়েছে রাঢ়ের ইতিহাস, রাঢ়ের মানুষ, তার জীবন, তার উৎসব, তার সঙ্গীত। সব মিলিয়ে তার সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন আঞ্চলিক রীতিতে। তারাশঙ্কর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন -

> ... বীরভূম একই সাথে শাক্ত ও বৈষ্ণব। বীরভূমের এই দ্বৈতভাব বুঝতে না পারলে বীরভূমকে বোঝা যাবে না, তারাশঙ্করকেও না।

আবার ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

> অনেক সময় মনে হয় তারাশঙ্কর ঠিক ঔপন্যাসিক নহেন, তিনি গ্রাম্যজীবনের চারণ কবি।

আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন 'সুক্ষেত্রে সম্রাট'। এই গ্রাম্যজীবন এবং সুক্ষেত্র হল রাঢ় অঞ্চলের মাটি আর মানুষ। জগদীশ ভট্টাচার্যের কথাকে অনুসরণ করে বলা যায় তারাশঙ্কর "আমাদের কথাসাহিত্যকে সেখানে পৌঁছে দিলেন সেখানে ব্যক্তি বিশেষের

সুখ দুঃখ নয় এক বিপুলায়তন জনপদের লক্ষ মানুষের জীবনের কলধ্বনি তাতে শোনা যাচ্ছে।" [১১]

তার গল্পে ব্রাত্য-গোত্রহীন মানুষেরা উঠে এল নায়ক নায়িকা হয়ে। ডোম, বাউরী, বাগ্দী, কাহার, বেঁদে, সাঁওতাল হয়ে উঠল নতুন সাহিত্যের নায়ক। অন্ত্যজ যাযাবর মানুষদের আদিম জীবন নিয়ে তারাশঙ্কর বেশ কিছু গল্প লিখেছেন যেমন 'বেদেনী' গল্পে দেখা যায়, এখানে রয়েছে উন্নততর জীবনের আকাঙ্ক্ষায় একটি মেয়ের নিরন্তন প্রয়াশ। 'যাদুকরী' গল্পের আরম্ভ হয়েছে বীরভূমেরই একটি গ্রামের বাজিকর সম্প্রদায়ের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এ গল্পে পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে বাজিকরীর বিচিত্র চরিত্রকে প্রকাশের জন্যই। তারাশঙ্করের বহু ছোট বড় গল্পে ফুটে উঠেছে যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দীর্ণ সময়পটের সংকট ছবি। 'পৌষলক্ষ্মী', 'তিনশূন্য', 'ইস্কাপন', 'মরামাটি' 'অহেতুক' 'বোবাকান্না' প্রভৃতি তারই চিহ্ন স্পষ্ট। "আকালের পর বান, বানের পর মড়ক। নরমুন্ড গড়াগড়ি কথার কথা নয়।' - এ প্রত্যক্ষ বাস্তব, অথবা 'বোবাকান্না' গল্পে দেখা যায় 'গ্রামে লোক নাই, অন্নহীন গ্রাম ছেড়ে নর মাংসের লোভে তারা শ্মশানে গিয়ে পড়েছে।' 'তিনশূন্য' গল্পে দুর্ভিক্ষের আরো নগ্নছবি ফুটে উঠেছে - 'ওদিকে তখন কঙ্কালের দলের মধ্যে কলহ বেধে গেছে। নর্দমা দিয়ে গড়িয়ে পড়া ফ্যানের ভাগ নিয়ে কলহ। ..."

তারাশঙ্কর তার গল্পগুলিতে দেখালেন গ্রামীন সমাজ কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে যন্ত্র সভ্যতা কিভাবে গ্রাস করছে কৃষিকে, জমিদার আর ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্বে কিভাবে পিছিয়ে পড়ছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। যন্ত্র নির্ভর উপাদান ব্যবস্থা আধুনিক ইনডাস্ট্রি কিভাবে সংরক্ষিত গ্রামীন সমাজের শাসন ও অবরোধকে ভেঙে দিচ্ছে, সেই সঙ্গে আধুনিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য গ্রামের অবহেলিত মানুষকে প্রলুব্ধ করছে। জমিদার

শ্রেণীর ভাঙনের চিত্র তাঁর গল্পে অন্যতম প্রধান বিষয়। এই চিত্র দেখা যায় 'জলসাঘর' 'রায়বাড়ি' 'অগ্রদানী' ইত্যাদি গল্পে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহজিয়া প্রেমকে দেখিয়েছেন তাঁর 'রসকলি' 'রাইকমল' গল্পে। এই গল্পগুলিতে বৈষ্ণবরস স্ফুরণ ঘটেছে তার ঘনিষ্ট অভিজ্ঞতা লব্ধ হৃদয়ানুভূতির ফলেই। তারাশঙ্করের গল্পে দেখা যায় পাত্র-পাত্রীরা তাদের আদিম প্রাকৃতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে নি। তারাশঙ্করের শিল্প প্রতিভার এটাই প্রধান উপাদান। কেবল প্রসঙ্গে নয়, তার প্রকরণের মধ্যেও দেখা যায় এই unsophisticated আদিমতা ও অকৃত্রিমতা। মানুষের জীবন প্রকৃতির দ্বারাই চালিত, এই প্রকৃতির লীলাকে তারাশঙ্কর অস্বীকার করেননি। তার সাহিত্যে এই প্রকৃতি জীবনীশক্তি রূপেই স্থান পেয়েছে। 'প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত মানুষের জীবনে এই জীবনীশক্তিকেই তিনি পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতি ভাল-মন্দ, শুচি-অশুচি, সুন্দর-অসুন্দরের সমস্ত খন্ডিত চেতনার উর্ধ্বে।" [১২] তার বিভিন্ন গল্পে প্রবৃত্তি মানুষের নিয়তি হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই প্রবৃত্তির বাঁধনে মানুষ আবদ্ধ, এর থেকে মানুষের মুক্তি নেই। প্রকৃতিরূপী নিয়তির অনিবার্য পরিণাম থেকেও মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। যেমন 'তারিনীমাঝি' গল্পে শেষ পর্যন্ত তারিনীমাঝি তার একমাত্র আপনজন স্ত্রী সুখীকে বাঁচাবার চেষ্টায় বিফল হয়ে নিজেকেই বাঁচাতে সচেষ্ট হয়। এখানেও তারিনী মাঝি আত্মরক্ষার আদিম প্রকৃতির কাছে পরাস্ত হয়েছে। জগদীশ ভট্টাচার্য-এর কথাকে সমর্থন করে বলা যায় - " তাঁর উপন্যাসের বিপুলায়তনের মধ্যে ধরা পড়েছে জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র, আর ছোট গল্পে আছে জীবনের খন্ডাংশের মধ্যেই তার অসাধারণ মহিমার ব্যঞ্জনা। উপন্যাসে আছে বিস্তৃতি, ছোটগল্পে গভীরতা। ... নিজের ব্যক্তি-সাধনায় প্রত্যক্ষীভূত জীবনের কোনো বিশেষ রূপকে তিনি ধ্যান করেননি, বরং তাঁর কবি-কল্পনাকে আশ্রয় করে জীবন সত্যই যেন নিজেকে প্রকাশ করেছে। এখানেই তারাশঙ্করের প্রতিভার মুখ্য বৈশিষ্ট্য।" [১৩]

প্রায় শিল্পীর ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা কিছু না কিছু উপকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর মধ্যে অন্যতম উপকরণ হলো প্রকৃতি। কথাসাহিত্যের অন্যতম শিল্পী বিভূতিভূষণের রচনা দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মানুষ - এই তিন আয়তনের ওপর। মানুষকে দেখার আগ্রহ তার রচনায় লক্ষ্য করা যায়, যেটা বিশ শতকের আগ্রহ ও বৈশিষ্ট্য। বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি বিস্ময়করকে আবিষ্কার করে যান। বিস্মিত হওয়া এবং বিস্মিত করা বিভূতিভূষণের লক্ষ্য। মানুষের চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে প্রকৃতির চাওয়া পাওয়াকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। বরং এই প্রকৃতিকে নিয়েই তিনি একটা সম্পূর্ণ সত্যে উপনীত হতে চান। অন্তর্বিশ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিভূতিভূষণ প্রাধান্য দিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য বা Identity mark হলো বিশ শতকের বিষয়। যেমন 'পুঁই মাচা' গল্পে পুঁইশাক দাঁড়িয়ে যায় একটা বিশেষ ভাবনার রূপ হিসেবে। নিজের মতো হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা যেটা ক্ষেন্তির মধ্যে ছিল। আবার 'মৌরীফুল' গল্পে মেয়েটি মৌরীফুলের মতো হয়ে উঠতে চায়। প্রকৃতির মধ্যেই তিনি আত্মাকে অনুভব করেছেন। আবার 'আহ্বান' গল্পে দেখা যায় ভিন্ন বয়সের ভিন্ন পরিবেশের দুটো মানুষ মানুষীর মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। একটি প্রতিবাদী ব্যক্তিসত্তার দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হওয়াই এ গল্পের মূল লক্ষ্য। তাঁর বেশ কিছু গল্পে দেখা যায় দারিদ্রের কারণে মানুষ কতখানি অসহায়, কিন্তু তার মধ্যেও বেঁচে থাকার আকুল প্রয়াস। যেমন পুঁইমাচা গল্পে ক্ষেন্তি সজেজ পুঁইশাকের বদলে শুকিয়ে যাওয়া পুঁই ডাটাতেই খুশি। মানুষ শুধুমাত্র খেয়ে পড়ে বাঁচতে চায় কিন্তু এই সব মানুষেরা সেটাও পায় না। লেখক এই গল্পে অসাধারণ চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। গল্পের শেষে দেখা যায় ক্ষেন্তি বেঁচে নেই, পুঁইশাক জীবন লাবণ্যে ভরপুর হয়েছে। ক্ষেন্তি বেঁচে থাকলে সেও জীবন লাবণ্যে ভরপুর হতো। এখানে বোঝা যায় তার মৃত্যু কতখানি ভয়ংকর। প্রকৃতি ব্যর্থ হয়ে যায় মানুষ ব্যর্থ হয়ে যায় বলে। বিভূতিভূষণের গল্পে কোন সমালোচনা দেখা যায় না। কোন রকম প্রতিবাদও মুখ্য হয়ে ওঠে না। মানুষের

আকাঙ্ক্ষা, তার অসহায়তা অথবা অপার জিজ্ঞাসা-ই তার রচনার মূল বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির শান্ত, সৌন্দর্য রূপই তার গল্পগুলিতে বিশেষতঃ গ্রাম্য প্রকৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। গুলঞ্চলতা, টুনটুনি পাখি, একটা প্রান্তর - এই সব প্রাত্যহিক জীবনে দেখা বস্তু বা বিষয়কে তিনি অপরিচিতের আবরণে আচ্ছাদিত করেন। রোম্যান্টিকতা যে আদর্শ ব্যবহার করে সেটার মধ্যেই তিনি একটা সত্যতা খুঁজে নেবার অবকাশ সৃষ্টি করেন। তিনি মানুষের বোধ, উপলব্ধির ওপরে জোর দেন যা আমাদের অন্তর্গত রক্তের মাঝে খেলা করে, যা দোলাচল সৃষ্টি করে।

—

কল্লোলের সময়ের অন্যতম প্রতিভাবান লেখক হলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মার্কসীয় অনুষঙ্গ এবং বিজ্ঞান বোধের অনুষঙ্গ নিয়ে সর্বদা 'কেন'র উত্তর খুঁজেছেন তিনি। যুদ্ধ, মন্বন্তর আমাদের মূল্যবোধগুলিকে কীভাবে ভেঙে দিচ্ছে তা তিনি দেখিয়েছেন। শুধু দুর্নীতি, শোষণ, অত্যাচার, অনাহারের মৃত্যুর ছবি নয়, কী কারণে কোন সূত্রে এই বিপর্যয় নেমে আসছে তার বিশ্লেষণ করে তিনি সামাজিক বাস্তবতার নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। হতমান্ দারিদ্র্যের প্রতি তার সমর্থন থাকে যদি সে বাঁচতে চায়। যেমন 'ভিখুর' প্রতি তার অসীম দরদ 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে দেখা যায়। আবার 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে নীলমণির প্রতি সহানুভূতি দেখা যায়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে দরিদ্র, শোষিত ঐক্যবদ্ধ মানুষের মিছিল দেখা যায়। নির্যাতিত মানুষ যে একদিন ঐক্য-বদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে এই উপলব্ধিতার গল্পে রয়েছে। তার গল্পগুলিতে বেঁচে থাকার শর্ত বার বার উচ্চারিত হয়েছে। মানুষের জীবনের অন্যতম দিক যৌন আকাঙ্ক্ষা তাকেও তিনি গল্পের চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছেন - 'প্রাগৈতিহাসিক' 'সরীসৃপ' 'হলুদপোড়া' 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' ইত্যাদি গল্পে।

মন্বন্তরের সময়কালেই 'সমুদ্রের স্বাদ' নামে যে গল্প সংকলন বের হয় তাতেই তাঁর সামাজিক শ্রেণীচেতনার দিকটি ধরা পড়ে। যুদ্ধ, মন্বন্তর আমাদের মূল্য-বোধকে যেভাবে ভেঙে দিয়েছে, প্রশাসনিক স্তর এবং সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণীস্তরের সম্পর্কটা যেভাবে নগ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে তাতে মাণিকের মতো অনেক শিল্পীই সমাজ সচেতন হয়ে পড়েছেন। তাঁর 'ভেজাল' গল্প সংকলনে মধ্যবিত্তের বিপর্যস্ত মূল্যবোধের অসাধারণ ছবি আছে 'ভয়ঙ্কর' 'ধনযৌবন' ইত্যাদি গল্পে। এই অমানবিকতার ছবি আরো তীব্রমাত্রা পেয়েছে 'আজকাল পরশুর গল্প' সংকলনে। 'দুঃশাসনীয়' এই সময়কার প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প। এই গল্পটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবছায়া রূপকাবরনে ঘেরা নারীর সংস্কার সিদ্ধ লজ্জার এমন বর্বর উলঙ্গতা সাধন, যে সমাজ ব্যবস্থার কীর্তি, তাকেই লজ্জা পাইয়ে দিতে লেখক তির্যক বাগভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। তার 'টিকটিকি' গল্পে কোথাও আলো দেখা যায় না, কুৎসিত আবহাওয়া দিয়ে সমস্ত পরিণামকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে টিকটিকির রূপের মধ্যে। মানুষও এখানে 'টিকটিকি' হয়ে যাচ্ছে, কাফ্কার 'মেটামরফসিস' গল্পের পোকা হয়ে যাবার মতো। এই গল্পে জ্যোতিষার্ণব তার স্ত্রীর মৃত্যুকেও ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করে। দুরূহ বাকভঙ্গী, অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার করে এই গল্পগুলিকে তিনি জটিল করেছেন তাই নয় সেই সঙ্গে গল্পগুলি আধুনিক শিল্প হয়ে উঠেছে।

সাধারণ বা হীনবর্গের মানুষদের নিয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন আর তারাশঙ্কর মানুষের হারজিতের কথাকে বলেছেন। কিন্তু মাণিকের স্বাতন্ত্র হলো নিম্নবর্গের মানুষ জিতবে কিনা। মাণিকের যুক্তি হলো মানুষ চরিতার্থ চায়, স্বাভাবিক পথে সেটা না হলে না-স্বাভাবিক পথেই তাকে অর্জন করবে। মানুষের খেয়ে পড়ে বাঁচার অধিকার আছে, এই সৎ আকাঙ্ক্ষার জন্য মাণিক তাদের সমর্থন করে। মধ্যবিত্তের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে তিনি গল্পগুলোতে দেখিয়েছেন যে তার একমাত্র উপায় হলো সে হীনবিত্ত

হয়ে গেছে এই বোধ নিয়ে হীনবিত্তদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া। জীবন বিমুখতা নয় জীবন উন্মুখতাই মাণিকের গল্পের লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের প্রতি প্রীতি তাঁর প্রায় সব গল্পেই রয়েছে এই বাস্তবতাকে অঙ্কন করার জন্য তাঁকে সাহায্য করেছে মার্কস্-সীজম ও তার বৈজ্ঞানিক মন। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন যে তার ৪৮এর গল্প গুলো মৃতদেহের মতো ঠাণ্ডা'। জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলো অন্ধকারেই জন্ম অন্ধকারেই শেষ। মাণিক তার উত্তরসূরী হয়ে অন্ধকারের চর্চা করেন, কিন্তু অন্ধকার থেকে বেড়িয়ে আসার পথও তিনি খোঁজেন। তার প্রথম পর্বের গল্পে রয়েছে কিছু করার চেষ্টা। শেষ পর্বের গল্পে এই দেখাটা আরো সচেতনভাবে এসেছে। জীবনকে ব্যাখ্যা করার জন্যই - মাণিক ফ্রয়েড এবং মার্কসীজমকে গ্রহণ করেছেন। জীবনকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যখনই ফ্রয়েডতত্ত্ব তাকে সাহায্য করতে পারছে না তখনই তিনি তা বর্জন করে মার্কসতত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন। তাই গিরিনের (হলুদপোড়া) মনস্তত্ত্ব আর ময়নার মা'র (হারানের নাতজামাই) মনস্তত্ত্ব এক নয়। চারু পরীর মৃত্যু (সরীসৃপ) আর রাবেয়ার মৃত্যু (দুঃশাসনীয়) এক নয়। রাবেয়া মৃত্যুকেই স্বামী বলে মনে করে। সে আত্মহত্যা করে আত্মরক্ষার জন্য।

শুধু সমস্যার চিত্র অঙ্কন করাকে তিনি শ্রেয় মনে করেন না, যেটা প্রেমেন্দ্র মিত্র করেছেন। তিনি সর্বদা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। মাণিকের সাহিত্য, উদ্দেশ্য-প্রধান বা প্রচারধর্মী বলে মনে হলেও তা শিল্প হয়ে উঠেছে, কারণ এই সাহিত্য একটা বাণী বহন করে। এই বাণী কেবল এক শ্রেণীর মানুষের বা কোন পার্টির জন্য নয়। এই বাণী সব পীড়িত মানুষের জন্য। তার সাহিত্য নির্বিশেষত্ব দেয়, তাই তার রচনা মূল্যবান সাহিত্যের উৎকর্ষ লাভ করেছে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার গল্পে সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন ঠিকই কিন্তু সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রের সঙ্গে কৃষিজীবী, শ্রমিকদের অনিবার্য সংঘাতের কথা বলেছেন অনেক

আগেই - সুবোধ ঘোষ তার ফসিল গল্পে। কল্লোল, কালিকলমের লেখকেরা তাদের গল্প উপন্যাসে আঞ্চলিক, অবহেলিত বা না-সামাজিক মানুষের জীবন্ত ছবি ফুটিয়ে বাস্তবতাকে এনেছিলেন। সুবোধ ঘোষ তার গল্পে এনেছেন গোটা সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো এবং তার প্রকাশ্য ও গোপন কার্যকলাপ। কীভাবে সামন্ততন্ত্র পেরিয়ে ধনতন্ত্রের মালিক শ্রমিকের মধ্যে অনিবার্য সংঘর্ষ নিয়ে আসছে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক পালটে দিচ্ছে, সেই সামাজিক বাস্তবতার একটা সামগ্রিক ছবি।

সুবোধ ঘোষের প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক'-এ রয়েছে অচল ট্যাক্সি গাড়ীর প্রতি তার মালিকের আশ্চর্য মমত্ববোধ, মানুষ আর যন্ত্র এখানে অভিন্ন সত্তা লাভ করেছে। অর্থাৎ সুবোধ ঘোষ এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ভাবনাকে ছোট গল্পের জগতে নিয়ে এলেন। ধনতন্ত্রের মালিকের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের সংঘাতে বিশ্বাসঘাতকতার বিদ্রূপময় ছবি আছে তার 'গোত্রান্তর' গল্পে। আবার ভদ্র মধ্যবিত্তের নীতি, আভিজাত্য-বোধ ও সংস্কারকে বিদ্রূপ করা হয়েছে 'পরশুরামের কুঠার' 'সুন্দরম্' ইত্যাদি গল্পে। যুদ্ধ, মন্বন্তর, বেকারত্ব মানুষের মূল্যবোধকে কিভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে সেটা, তার গল্পগুলোকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়। পতিতাদের জীবন নিয়ে কাহিনী উঠে এসেছে এই সময়কার অন্যান্য লেখকদের গল্পে। সুবোধ ঘোষের পতিতাদের নিয়ে কাহিনীতেও দেখা যায় সেই জীবন থেকে বেড়িয়ে আসার প্রচেষ্টা। দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে সমাজের যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে এবং তার ফলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যে উত্থান পতন হয়েছিল এটাই সুবোধ ঘোষের গল্পের উপজীব্য। 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ' গল্পে তিনি নিয়ে এসেছেন অটলনাথের মতো অর্থলোভী মানুষের কথা যারা অর্থের বিনিময়ে মানুষের প্রেম ভালোবাসাকেও ক্রয় করতে চায়। আর অন্যদিকে রয়েছে প্রতাপ বাবুদের মতো ক্ষয়িষ্ণু জমিদার যারা এই সব যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ ধনী হওয়া মানুষের কাছে নিজেদের বিক্রী করতে বাধ্য হয়। সেই সঙ্গে রয়েছে মধ্যবিত্ত ভীরুতা।

অগাষ্ট আন্দোলনের সাহসী ভূমিকা সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে গল্প তিনি তির্যক বিদ্রূপে ও সাংকেতিক ভাষায় লিখেছেন যা পাঠকের মনে গভীরে দাগ কাটে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে বেঁচে থাকার জন্য লড়াইয়ের চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু সুবোধ ঘোষের গল্পে এই বেঁচে থাকার চেষ্টা থাকলেও সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কিভাবে মানুষ তার মূল্যবোধ নীতিবোধ হারিয়ে মৃত মানুষে পরিণত হচ্ছে। একটা বৃহৎ সংকটের মুখে মানুষ যে কতখানি অসহায় সেটাই সুবোধ ঘোষের গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পে সময়কাল একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে। সেটা সম্ভবতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল। 'সুবোধ ঘোষ এমন একজন গল্প লেখক যার এক একটি গল্পের কৃৎ-কৌশল আমাদের সামনে বহু সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়।'[১৪]

এই তিন শিল্পীর পূর্ববর্তীদের মধ্যে জগদীশ গুপ্তের গল্প উপন্যাসে শরীর বা দৈহিক আকর্ষণ বিষয়ে যে উত্তাপ রয়েছে তা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'পঞ্চাঙ্গ' গল্পটিকে মনে পড়িয়ে দেয়, কিন্তু দুজনের ভাবনার কৌশলে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। আবার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মিল রয়েছে যেখানে দুজনেই মনোলোকের জটিলতার বিশ্লেষণে আগ্রহী। কিন্তু তফাৎ হলো মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে দেখেছেন সমাজনীতি, রাজনীতির পরিবর্তমান মূল্যবোধের পটভূমিতে, আর নরেন্দ্রনাথ নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষকে বিভিন্ন সম্পর্কে, পারস্পরিক সংঘাত-অর্ন্তসংঘাতে রেখে দেখেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'জীবনের জটিলতার শিল্পরূপায়ণে, ব্যক্তি-মানুষের স্বভাব বিশ্লেষণে মাণিকের

যতোই নির্মোহ নিপুণ শিল্পী।'[১৫] কিন্তু মাণিকের যতো তিনি রাজনীতি, সমাজনীতি সচেতন শিল্পী নন, বরং ব্যক্তিজীবনে ও সাহিত্যজীবনে ইনট্রোভার্ট - বাস্তব দৃশ্য ছাড়িয়ে অন্তর্লোকে জ্যোতিরিন্দ্রের উত্তরণ, তার ছিল এক ধরণের বিশিষ্ট সৌন্দর্যচেতনা, যে সৌন্দর্য সামগ্রিক, নিগূঢ়, সম্পূর্ণ। এই বিশিষ্ট প্রকৃতি চেতনা রয়েছে বিভূতিভূষণের মধ্যে যা ঈশ্বরের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীরসৌন্দর্য চেতনায় সঙ্গে এখানেই তার তফাৎ।

তথ্যপঞ্জী

১. ভূদেব চৌধুরী - 'বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার', প্রকাশকাল ১৯৮১, পৃ.৩৬১

২. তদেব, পৃ.৩৭৪

৩. হাসানআজিজুল হক - 'কথাসাহিত্যে বিপরীত স্রোত' (সমরেশ বসু সম্পাদিত জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, প্রকাশ-১৯৯৩, পৃ.২০৪)

৪. সুমিতা চক্রবর্তী - 'ভিন্ন আঙ্গিকের সন্ধানে' (সমরেশ বসু সম্পাদিত, জগদীশ গুপ্ত জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৩, পৃ.১৮৫)

৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী - 'জগদীশগুপ্ত ও তার সমকালীন কয়েকজন ঔপন্যাসিক' (সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত, জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, ১৯৯৩ পৃ.১০৭)

৬. অশ্রুকুমার সিকদার - আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ.৭২-৭৩

৭. তদেব, পৃ.৭৪

৮. তদেব, পৃ.৯৩

৯. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় - 'ভাঙাবন্দর ও আসল সমুদ্রের গল্প' - দেশ পত্রিকা, ১৯৮৮, ৪ঠা জুন, পৃ.৪৩-৪৮

১০. তদেব, পৃ.৪৩-৪৮

১১. জগদীশ ভট্টাচার্য - 'আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী', ১৯৯৪, পৃ.২০

১২. তদেব, পৃ.২২

১৩. তদেব, পৃ.৩৭

১৪. সুমিতা চক্রবর্তী - 'সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প' দেশ পত্রিকা ১৯৯৫ ২৫শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ৯, পৃ.

১৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় - কালের পুতুলিকা, ১৯৯৫, পৃ.৪৩৩